শ্রদ্ধাঞ্জলি

# ফিরোজা বেগম
# তার শেষ দান

● ইমতিয়ার শামীম

মৃত্যুর ব্যথা তিনি অনেক আগেই দিয়েছেন আমাদের– বার বার, জীবনের স্বাদ নিয়ে জেগে ওঠার তুমুল আয়োজনের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের নিয়ে গেছেন মৃত্যুময়তার কাছে। কিন্তু গত ৯ সেপ্টেম্বর মৃত্যুর সেই ব্যথাকে আমরা অনুভব করলাম চূড়ান্ত অর্থে, বয়ে বেড়ানোর বিবরে প্রবেশের মধ্য দিয়ে। 'এই কি গো শেষ দান/ বিরহ দিয়ে গেলে...' গেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু নিজেও শেষ দান হিসেবে রেখে গেলেন বিরহকেই।

যাদের পায়ের চিহ্ন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে বাঙালি সমাজের জাগরণে স্থায়ী ছাপ আঁকতে পেরেছে– তিনি, ফিরোজা বেগম, তাদেরই একজন। ১৯৩০ সালের ২৮ জুলাই জন্ম হয় তার গোপালগঞ্জ জেলার রাতইল ঘোনাপাড়া গ্রামে। গোপালগঞ্জ তথা ফরিদপুর ওই সময়ে বাংলার সাংস্কৃতিক চর্চার অন্যতম পীঠস্থান। তার বাবা খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল ছিলেন আইনজীবী। মা কওরুন্নেসা নিজেও গান গাইতেন, ছিলেন সংস্কৃতিমনা ও সংগীতানুরাগী। এমনকি গানও গাইতেন তিনি– যা ফিরোজা বেগমকে গান গাওয়ার পথ চলতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, বলা যায় নিঃসংশয়ে। ফিরোজা ছিলেন মেধাবী ছাত্রী, প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হওয়ার ব্যাপারটি তার জীবনে নেই বললেই চলে। গান গাওয়ার পথে আসার পর সেখানেও দেখি আমরা সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা– দেখি তার পথিকৃৎ ভূমিকা।

ফিরোজা তখন কেবল ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী– ওই সময়েই অল ইন্ডিয়া রেডিওতে গান গেয়ে দু-বাংলাতেই আলোড়ন তোলেন। একটি অনুষ্ঠানে তার গাওয়া গান শুনে মুগ্ধ হন অল ইন্ডিয়া রেডিওর সুনীল বোস। তিনিই তাকে নিয়ে যান গ্রামোফোন কোম্পানি এইচএমভিতে। সেখানে গিয়ে তার পরিচয় হয় কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে। নজরুলের সঙ্গে পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তার সংগীতচর্চা নতুন এক বাঁক খুঁজে পায়। নজরুল তাকে ডাকতেন 'গানের পাখি' নামে। নজরুলের সঙ্গে পরিচিতির দিনেই তার পরিচয় হয় সুরকার কমল দাশগুপ্তের সঙ্গে– পরে ১৯৫৫ সালে তারই সঙ্গে বিয়ে হয় তার। ওইদিন তিনি সেখানে খালি গলায় গেয়ে শোনান, 'যদি পরানে না জাগে আকুল পিয়াসা...।' আর তা শুনে মুগ্ধ হন কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯৪২ সালে মাত্র ১২ বছর বয়সে নামকরা গ্রামোফোন কোম্পানি এইচএমভি থেকে প্রকাশ পায় তার গানের রেকর্ড। একপিঠে 'মোর আঁখিপাতে' আর অন্যপিঠে 'মরুর বুকে জীবনধারা কে বহাল' গান নিয়ে এইচএমভি থেকে বের হয় তার প্রথম গানের রেকর্ড। এ রেকর্ড প্রকাশ পাওয়ার কথা সাড়ম্বরে প্রচারিত হয় বিভিন্ন সংবাদপত্রে। খুব অল্প বয়সেই সাফল্য ধরা দেয় তার কাছে। আর সে সাফল্য এনে দেয় নজরুলের লেখা ও তার গাওয়া গান 'দূর দ্বীপবাসিনী' এবং 'মোমের পুতুল' গান দুটি। এরপর তাকে পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি আর।

নজরুল সংগীতকে আলাদা পরিচিতি দেয়ার ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা রেখেছেন ফিরোজা বেগম। কমল দাশগুপ্ত নজরুলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গানের সুর দিয়েছেন। পরে ফিরোজা বেগম নিজেও নজরুলের গানে সুর দেয়ার কাজ শুরু করেন। সঙ্গে আরো একটি কাজ করেন তিনি, শুরু করেন নজরুলের গানের স্বরলিপি ও সুর সংরক্ষণের কাজ। মাত্র আড়াই বছরের মতো সুস্থ কাজী নজরুল ইসলামের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু নজরুলের গানের সাধনাই তিনি করে গেছেন সারা জীবন। নজরুল তাকে ডাকতেন 'গানের পাখি' বলে, আর তিনি নজরুলের গানকে সবার কাছে পরিচিত করে তোলেন 'নজরুলসংগীত' নামে। এইচএমভি কোম্পানি তার গাওয়া গান দিয়েই প্রথম প্রকাশ করে নজরুলসংগীতের একক লং প্লে। তবে কেবল নজরুলসংগীতই তো নয়, তিনি রবীন্দ্রসংগীতও গেয়েছেন, গেয়েছেন আধুনিক গান, গজল, কাওয়ালি এবং ভজন। সারাবিশ্বে ৩৮০টির মতো একক সংগীতানুষ্ঠান করেছেন তিনি– পরিচিত করে তুলেছেন নজরুলসংগীতকে। সাত দশক ধরে তিনি নিরন্তর যুক্ত থেকেছেন নজরুলসংগীতকে জনপ্রিয় করে তোলার কাজে, শুদ্ধ স্বরলিপি ও সুর সংরক্ষণের কাজে। দেশবিভাগের পর ১৯৬৭ সালে ঢাকায় চলে আসার আগপর্যন্ত ফিরোজা বেগম কলকাতাতেই ছিলেন। তারপরও ঢাকা শর্ট ওয়েভ রেডিওর যাত্রা শুরু হয় তার আর তালাত মাহমুদের গাওয়া গান দিয়ে ১৯৪৯ সালে। ঢাকা নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউটেরও তিনি ছিলেন প্রথম চেয়ারম্যান। দেশ-বিদেশ থেকে নিজের অবদানের জন্য তিনি পেয়েছেন অনেক স্বীকৃতি ও সম্মান। পেয়েছেন একুশে পদক, স্বাধীনতা পদক, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র পুরস্কার, সত্যজিৎ রায় পুরস্কার, নাসিরউদ্দিন পুরস্কার, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি স্বর্ণপদক, সেরা নজরুল সংগীতশিল্পী পুরস্কার (টানা কয়েক বছর), নজরুল আকাদেমি পদক, চুরুলিয়া স্বর্ণপদক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডিলিট ইত্যাদি। কমল দাশগুপ্ত ও তার সংসারে রয়েছে তিন ছেলে– যার মধ্যে হামিন আহমেদ ও শাফিন আহমেদ সুপরিচিত ব্যান্ড সংগীতের ভুবনে। বড় ছেলে তাহসিন আহমেদ থাকেন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে। বয়স ৮৪ হলেও ফিরোজা বেগমের মৃত্যু অনেকটাই আকস্মিক– কেননা বয়সজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হলেও কিছুদিন আগেও কর্মক্ষমই ছিলেন তিনি।

ফিরোজার গান আমাদের নিয়ে যায় অপার্থিব এক অনুভূতির জগতে। আমরা সেই সময়ের মানুষ, যখন ফিরোজাও জীবিত ছিলেন। প্রযুক্তি তার কণ্ঠকে অনন্তকাল ধরে রাখবে, কিন্তু সামনাসামনি সেই কণ্ঠ শোনার দুর্লভ অংশীদার কেবল আমরাই। 'পথ চলিতে' চকিতে হঠাৎ করে তার আর দেখা পাওয়া যাবে না; কিন্তু এখনো যখন শুনি তিনি গাইছেন 'আমি চাঁদ নহি, চাঁদ নহি, অভিশাপ...' আমরা শিউরে উঠি, এক জীবনে মানুষ এত কিছু দিতে পারে? এ-ও সম্ভব? ■